Journal of Rajshahi College
Rajshahi 6000, Bangladesh
www.rc.gov.bd
J R C

Open Access
ISSN 2959-8702

Original Article

সংস্কৃত সাহিত্যের দর্পণে অভিজাত বর্ণ বনাম দলিতদের পারস্পারিক সম্পর্ক

(Interrelationship Between the Elite Varna and Dalits as Reflected in Sanskrit Literature)

কৌশিক সরকার
(Kaushik Sarkar)

সহকারী অধ্যাপক, বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, হুগলি ৭১২১৪৭ এবং পিএইচডি গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
(Assistant Professor, Bijoy Narayan College, Hooghly 712147 & PhD Researcher, Jadavpur University, WB, India)

Author's e-mail: kaushiksarkar.blg@gmail.com

Received: 13 July 2024
Revised: 03 November 2024
Accepted: 12 December 2024
Published: 19 December 204

Volume 02
Issue 01
Page 1-6

Cite কৌসিক সরকার (২০২৪) সংস্কৃত সাহিত্যের দর্পণে অভিজাত বর্ণ বনাম দলিতদের পারস্পারিক সম্পর্ক। *J. Raj. Col.* **2**(1):1-6.
https://doi.org/10.5281/zenodo.21865956

© 2024 The Authors.
Journal of Rajshahi College published by Rajshahi College, Rajshahi 6000, Bangladesh.
www.rc.gov.bd

ABSTRACT: দল্ ধাতুর সহিত ক্ত প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'দলিত' শব্দটি এসেছে 'দলন' শব্দটি থেকে। 'দলন' বলতে আমরা যা বুঝি, তা হল কাউকে গায়ের জোরে বা মানসিক দিক দিয়ে বশ মানিয়ে, উপরে উঠতে না দেওয়া বা বলপূর্বক কাউকে দমিয়ে রাখা। এই প্রক্রিয়া মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি সব কিছুই জড়িত। প্রাচীন ভারতে মানুষ কর্তৃক মানুষের এই 'দলন' প্রক্রিয়া যেহেতু প্রধানত গোষ্ঠিবদ্ধভাবেই সংগঠিত হয়েছে, সেই কারণে 'দলনকারী' ও 'দলিত' সম্পর্কের বিভাজনটিও অনেকখানি গোষ্ঠিগত। ভারতে বর্ণভেদের ক্ষেত্রে 'শ্রম-বিভাজন'-এর তত্ত্বকথা গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী বর্ণভেদ চালু থাকলেও শেষপর্যন্ত তা জন্মসূত্রে জাতিভেদ প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে। হিন্দু বর্ণব্যবস্থার নিরিখে 'দলিত' বলতে সাধারণভাবে সেইসব জাতি-গোষ্ঠির মানুষদের বোঝায়, যাদের অবস্থান 'চারবর্ণের' বাইরে সে অর্থেই তারা 'অবর্ণ' বা 'অতিশূদ্র'।

Keywords: দলিত, অবর্ণ, শ্রেণি, জাতি, ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ধর্মপুরাণ

This article is licensed under a *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License*, which permits any non-commercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if you modified the licensed material. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষ যখন খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হয়েছিল, তখনই তারা স্থায়ী গোষ্ঠি গঠন করেছিল। পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠি পুনরায় বিবাহ ও জাতিত্বের বন্ধন দ্বারা শক্তপোক্ত হয়েছিল। বহু উপজাতি বা জনজাতি গোষ্ঠি প্রাক-আর্য সময়ে ছিল। আর্যদের আগমনের পূর্বে যেসব জনগোষ্ঠি ছিল, তারা আর্যদের দ্বারা 'দস্যু' ও 'দাস' নামে অভিহিত হয়েছেন। বস্তুগত পরিপ্রেক্ষিতে বদলের ফলে সামাজিক ভেদাভেদ এবং বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটে বর্ণ প্রথায়। জন্ম ও উত্তরাধিকার সূত্রের উপর গড়ে ওঠা ব্রাহ্মণ উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী, ক্ষত্রিয় দ্বিতীয়, বৈশ্য তৃতীয় এবং শূদ্র সবার নীচে অবস্থান করে। চতুর্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীনতম অনুমানটি আছে ঋগ্বেদে এর দশম মণ্ডলের 'পুরুষসূক্তে' বলা হয়েছে:

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত [১] ।।

এখানে বলা হয়েছে আদি-পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি, বাহু থেকে রাজন্যের, ঊরু থেকে বৈশ্যের ও পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি।

এছাড়াও মনুসংহিতায় অবিকল প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়েছেড়
লোকনান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ [২]।।

অর্থাৎ লোকবৃদ্ধির জন্য (স্রষ্টা) মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করলেন।

বর্ণ বৈষম্যের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, শ্রেণি ও বর্ণ বৈষম্যের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়, কেননা আমরা অনেক সময় এদের একটির সঙ্গে অন্যটিকে মিশিয়ে ফেলে ভুল করি। ঋগ্বৈদিক যুগে বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও, বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত। একথা মোটামুটি স্বীকৃত সত্য যে, সে যুগের মানুষ প্রধানতঃ বর্ণের ভিত্তিতে আর্য ও অনার্য এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রচলিত জাতিসমূহ ছারাও সে যুগে ব্রাত্য ও নিষাদ নামে দুটি পৃথক জনগোষ্ঠি ছিল। ড. রায়চৌধুরী বলেছেন, ব্রাত্যরা সম্ভবত ছিল ব্রাহ্মণ ধর্মের বহির্ভূত আর্য। তারা সাধারণত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিধান মানত না এবং যাযাবর জীবনযাপন করত। তবে নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারত। নিষাদরা ছিল অনার্য, নিষাদরা তাদের নিজস্ব স্ত্রামে নিজস্ব শাসক, স্থাপত্তের অধীনে বাস করত।

প্রতিটি বর্ণের বৃত্তি নির্দিষ্ট এবং বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া তা অপরিবর্তনীয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এমন অনেক সুবিধা ভোগ করতেন, যা বৈশ্য ও শূদ্রের আয়ত্তের বাইরে ছিল। বৈদিক যুগে জাত-বর্ণ ব্যবস্থা নিয়ে তেমন বিধি নিষেধ ছিল না, তা আমরা বহু উদাহরণে দেখতে পাই। যেমনড় উচ্চবর্ণের পুত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহকে 'অনুলোম' এবং নিম্নবর্ণের পুত্রের সঙ্গে উচ্চবর্ণের কন্যার বিবাহকে বলা হত 'প্রতিলোম'। অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা এবং এক বর্ণের মানুষ অপর বর্ণের বৃত্তি স্রহণ করলে বর্ণ সংকর সৃষ্টি হত। আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক দক্ষতার ভিত্তিতে বা পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণার ভিত্তিতে অথবা শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে সম্ভবত বর্ণব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল এবং বর্ণগুলোর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিভিন্ন তাগিদ ছিল। সেবক শ্রেণিরূপে শূদ্রদের কাজকর্মের কিছু উল্লেখ্য পাওয়া যায়। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, দেবতা ছাড়াই শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছিল প্রজাপতির পা থেকে, আর তাই গৃহস্বামীই হলেন তাঁদের দেবতা এবং তাঁর পা ধুয়েই তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে:

শূদ্রা অনুষ্টুপছন্দা বেশ্মপতিদেবস্; তস্মাদ্ উ পাদাবনেজ্যেনৈব জিজীবিষতি [৩] ।

অর্থাৎ একটি পরবর্তী সূত্রে যেমন বলা হয়েছে, উচ্চতর বর্ণের শুশ্রুষা করেই তাঁদের বাঁচতে হবে।

শুশ্রুষা শূত্রস্যেতরেষাং বর্ণানাম্ [৪] ।।

প্রথম সূত্রটি থেকে আরো জানা যায় যে, অশ্বমেধের ফলে পোষক বৈশ্য হয়ে ওঠেন ধনী আর উদীয়মান শূদ্র হন কর্মকর্তা। এবিষয়ে বলা হয়েছে:

উত্থাতা শূদ্রো দক্ষঃ কর্মকর্তা [৫] ।

'কর্মকর্তা' শব্দটি এখানে ভাড়া করা শ্রমিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা? সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও, বেদোত্তর সাহিত্যে অনুরূপ শব্দ 'কর্মকার' এর অর্থ সর্বদাই একইরূপ।৬ বৃহদারণ্যক উপনিষদে অবশ্য শূদ্রকে বলা হয়েছে 'পূষণ' বা পোষক। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে একই অভিধা 'পোষয়িষ্ণুঃ' বৈশ্যদের প্রতি প্রযুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে:

স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিংচ [৭]।।

এর থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, পুরুষমেধে ব্রাহ্মণদের উৎসর্গ করতে হবে পুরোহিতদের কাছে, রাজন্যদের অভিজাতবর্গের কাছে, বৈশ্যদের মরুৎদের (এক কৃষক সম্প্রদায়) কাছে, এবং শূদ্রদের শ্রমের কাছে।

সাধরণভাবে সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণের যখন আধিপত্য ছিল, সেই সময়েই সকল বর্ণগুলির মধ্যে তখনও কিছু সঞ্চারণশীলতা ছিল। বৈদিক যুগেও ব্রাহ্মণের ছেলে জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হত না এবং ব্রাহ্মণের ছেলের অন্য বর্ণে যেতে সংকোচ বা সমস্যা হত না। যোগ্যতা, রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণে যেতে পারত। ব্রাহ্মণ মনিষীরা যেমন সমাজকে শাস্ত্র, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, গণিত ইত্যাদি দিয়েছেন, তেমনই দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যায় অনেক কিছুই শূদ্রেরই উদ্ভাবন। গাড়ির চাকা, কুমোরের চাকা, তাঁতির তাঁত, রাজমিস্ত্রির মাপযোকের নকশা ও যন্ত্র, চাষের সেচপদ্ধতি, ঘর ছাওয়ার কৌশল, মাছ ধরার নানা ধরনের জাল, শিকারির ফাঁদ-গুলতি, তীর-ধনুক, ধাতু গলানোর কৌশল, পাথর কাটা ঘষা, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি, প্রাসাদ, বাগান, বিহার, গুহা তৈরি-এসব শূদ্রের উদ্ভাবন ও সৃষ্টি বললে অত্যুক্তি হবে না। শূদ্রদের নিজস্ব রচনা নাচগানও নিশ্চয় ঘুরপথে সমাজে পৌঁছে উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

ঋগ্বৈদিক যুগে শ্রমবিভাজন অনেকদূর এগিয়ে গেলেও, তাদের মধ্যে কোনো সামাজিক বিভাজন ছিল না। বিভিন্ন বর্ণের

মধ্যে সঞ্চারণশীলতা ছিল, কিন্তু যোগ্যতা, রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে পেশা পরিবর্তন হত।

আর্য নামে খ্যাত অধিবাসীদের মিলনের অসংখ্য উদাহরণ পাই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যে। মূলতঃ অবাধ বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে জন্মলাভ করেছে এই দুই মহাকাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র। এমনকি মহাভারতীয় সমাজে জারজ সন্তানরাও স্বীকৃত হতো যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং গুণের ভিত্তিতে। বিশ্বামিত্র তার বড় প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যিনি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ ধর্মে উন্নীত হয়েছিলেন।

তাহলে কি বলা যেতে পারে, বেদ-রামায়ণ-মহাভারতের কালের পরই রক্তের বিশুদ্ধভিত্তিক জাতের উৎপত্তি? কিন্তু এইরকম কথা কখনই বলা যায় না, কারণ আমরা জানতে পারি রামায়ণ ও মহাভারতের কাল। ভারতে এই কালের ব্যাপ্তি ছিল কমপক্ষে হাজার বছর (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ)। একথাও জানা যায় যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্মে জাত-পাত ছিল না, ফলে সকল মানুষই ছিল সমান অধিকার সম্পন্ন। বস্তুতঃ জাত-পাতের বিরোধিতা, ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বিনাশ ও যজ্ঞ কর্মে বিরোধিতা করেই বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছে। একসময় সমস্ত ভারতবর্ষ হয়ে যায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাই বলা যায়, বৌদ্ধ আমলে রক্তের বিশুদ্ধতা তো দুরের কথা বরং রক্তের মিশ্রণের ফলে ভারতীয় সকল জাতিই সন্দেহাতীতভাবে সংকরত্ব প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুদের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, এই জন্মগত জাতিভেদ প্রথাটির বয়স বড় জোর সাত-আট শত বছর। কিভাবে এই প্রথাটির উদ্ভব হয়েছে? তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ড. অতুল সুর (বাংলা ও বাঙ্গালির বিবর্তন: সাহিত্য লোক, ১৯১৪) তাঁর এই স্রন্থে বাংলার সামাজিক বিবর্তনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে দেখা যায় যে প্রাক্-পাল যুগে (প্রাক্ ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) চার বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) কোনো সমাজ ছিল না। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাংলায় ছিল কৌম (ট্রাইব) উপজাতি ভিত্তিক সমাজ। সাধারণত জনপদগুলি কৌম জাতির নামেই অভিহিত হতো। এই কৌম জাতিগুলি ছিল: পুণ্ড্র (পোদ), বঙ্গ, কর্বট (কৈবর্ত্য), বাগদি, সদ্ গোপ ও মল ইত্যাদি।

প্রাক্-পাল যুগে আমলে ধীরে ধীরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণরা বাংলায় আসা শুরু করে, তাদের উপাধি ছিল যথাক্রমে শর্মা ও স্বামিন ইত্যাদি। তাদের মধ্যে মূলত গাঁই প্রথা চালু হয়। মূলতঃ যে স্রামে তারা প্রথম উঠত, সেই স্রামের নামেই গাঁই প্রথা (ভট্ট, চট্ট, বন্দ্যো ইত্যাদি)। এই সময় আবার অব্রাহ্মণ জাতিসমূহের শেষাংশে থাকতঃ দত্ত, পাল, মিত্র, বর্মণ, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত, নাগ, চন্দ্র, দাম, ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব ও রুদ্র ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এগুলো এখন 'কায়স্থ' জাতির পদবি হলেও তখন ছিল নিতান্তই নামেরই শেষাংশ (জাতিবাচক নয়), কারণ তখন 'কায়স্থ' বলে কোনো জাতি ছিল না। এই যুগেই রাজকর্মচারী হিসাবে কিছু লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'কায়স্থ' শব্দ ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল রাজকর্মচারী, জাতি নয়। অপরদিকে কিছু লোকের উপাধি হিসাবে পাওয়া যায়: নগরশ্রেষ্ঠী, স্বার্থবাহ ও ব্যাপারী ইত্যাদি। উপাধি থেকে তাদের ব্যবসায়ী হিসাবে মনে হলেও এরা 'বৈশ্য' জাতির লোক ছিল না। অতএব এর থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাক্-পাল যুগে স্থানীয়দের মধ্যে জন্মগত কোনো জাতিভেদ ছিল না অর্থাৎ সমাজটি ছিল জাত-পাতহীন একটি সমতল সমাজ [৮]।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ পাল আমলেও (খ্রিস্টাব্দ ৭৫০-১২০০) সামাজিক চিত্র প্রায় অভিন্ন ছিল। এ যুগে কর্ম বা বৃত্তিভিত্তিক আরও কিছু উপাধির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই বৃত্তিগুলি হল: প্রতিবেশী, ক্ষেত্রকার (ভূমিকর্ষক), কুটুম্ব (প্রধান প্রধান গৃহস্থ), মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডাল।

এর সঙ্গে সঙ্গে নবম-দশম শতাব্দীর দিকেই ব্রাহ্মণরা জাতিভেদ প্রথার বীজ রোপণ করতে থাকে। তারা সুযোগ বুঝে চার বর্ণের আদলে সমাজকে বিভক্ত করার উদ্যোগ নেয়। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বাদে বাংলার সকল মানুষই 'সংকর' এবং '**শূদ্র**', কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই নির্ভেজাল।

পালযুগের পর আসে সেন রাজত্ব (ত্রয়োদশ শতকে)। বল্লাল সেনের সমসাময়িক কালে রচিত বৃহদ্ধর্মপুরাণেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে বাঙালি হিন্দুর জাতিবিন্যাস। এই বৃহদ্ধর্মপুরাণ দিয়ে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে হিন্দুর জাতিবিন্যাসও বারবার পরিবর্তন হয়। এই ক্রম বিকাশটি নিম্নে আলোচনা করা হল:

১. বৃহদ্ধর্মপুরাণের শ্রেণি বিভাগ: বৃহদ্ধর্মপুরাণে (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী) হিন্দুদেরকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি শ্রেণি হলড় (ক) উত্তম সঙ্কর (খ) মধ্যম সঙ্কর ও (গ) অ ন্ত্যজ। উপরোক্ত তিন শ্রেণিতে যে সকল জাতি পড়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল:

(ক) উত্তম সঙ্কর: শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যাদের পুরোহিত হিসেবে কাজ করতেন তারাই উত্তম সঙ্কর। এদের মধ্যে রয়েছে:

১. করণ বা কায়স্থ (সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা ও পুস্ড়কের নকল করা), ২. অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য (চিকিৎসা, সরকারী কাজে সাহায্য করা), ৩. উস্র (সৈনিক বৃত্তি), ৪. মগধ (কবি বা দৌত্য, বার্তাবহন ইত্যাদি), ৫. গন্ধবণিক (মশলাপাতি বা সুগন্ধি জিনিষের ব্যবসা), ৬. কাংস্যবণিক বা কংসকার (কাঁসার বাসন প্রস্তুতকারক), ৭. শঙ্খবণিক বা শাখিকা (শাখার জিনিস প্রস্তুতকারক), ৮. কুম্ভকার (মৃৎপাত্র প্রস্তুতকারক), ৯. তন্তুবায় (তাঁতী), ১০. কর্মকার (লৌহজাত জিনিস প্রস্তুতকারক), ১১. সদগোপ (লেখক), ১২. দাস (কৃষিজীবি), ১৩. রাজপুত, ১৪.

নাপিত, ১৫. মোদক (মিঠাই প্রস্তুতকারক), ১৬. বারুজীবী (পানচাষী), ১৭. সূত (কাঠের মিস্ত্রি), ১৮. মালাকার (ফুল বিক্রেতা), ১৯. তাম্বলি (পানবিক্রেতা) ও ২০. তৌলিক (সুপারী বিক্রেতা)।

(খ) মধ্যম সঙ্কর: ১.তক্ষক (কাঠের জিনিস প্রস্তুতকারক), ২. রজক (ধোপ্য), ৩. স্বর্ণকার (সোনার জিনিস প্রস্তুতকারক), ৪. সুবর্ণবণিক (হীরে-জহরের ব্যবসায়ী), ৫. আভীর (গোপালক অথবা দুগ্ধবিক্রেতা), ৬. তৈলকার (তেল প্রস্তুতকারক), ৭. ধীবর (মৎসজীবী), ৮. শৌণ্ডিক বা শৌণরিক (মদ্যব্যবসায়ী), ৯. নট্ট (নর্তকী, জোকার, ভাঁড়ামী ইত্যাদি) ১০. শবক, ১১. জালিক (মৎসজীবী)।

(গ) অন্ত্যজ: ১. গৃহি, ২. কুড়ব বা কুরঙ্গ (খেয়া পারাপারকারী), ৩. চণ্ডাল, ৪.বরুর বা বাউরা, ৫. চর্মকার (জুতো নির্মাণকারী), ৬. ঘণ্টজীবী বা পাটনী, ৭. দোলবাহী (পাল্কীবাহক) ও ৮. মল্ল।

উল্লেখ্য যে বৃহদ্ধর্মপুরাণ এ ৩৬ জাতের উল্লেখ্য জাতের উল্লেখ থাকলেও তালিকায় ৪১টি জাতের নাম পাওয় যায়। সম্ভবতঃ পাঁচটি জাতের নাম মূল স্রন্থের সাথে পরে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অনুরূপ এক তালিকা পাওয়া যায়। যেখানে সংকর জাতসমূহকে সৎ ও অসৎ শূদ্র এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মগধ, গন্ধবণিক, তৌলিক, দাস, বারুজীবী, সূত প্রভৃতি জাতের নাম নেই, তার পরিবর্তে ভিল্ল, কুবর প্রভৃতি জাতের নাম পাওয়া যায়। তাছাড়াও আভীর, নট্ট, শেখর, জালিক প্রভৃতি জাতের নাম অনুপস্থিত, এর পরিবর্তে অট্টালিকাকার, কোটক, লেট, মল্ল, চর্মকার, পৌঞ্জক, মাংসচ্ছেদ, কৈবর্ত, গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গি, আগরা, কৌয়ালী প্রভৃতি জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ রচনার কিছুকালের মধ্যেই জাতিবিন্যাসটিকে আরও পাকাপোক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। কারণ ইতিমধ্যেই মুসলমান শাসনের ফলে সমাজে হিন্দু-মুসলমান বড় হয়ে ওঠে। ড. সুরের মতে তাই বেদে বিশ্বাসী পণ্ডিতগণ একটি অতিকথন তৈরি করে, বলা হয় হিন্দুদের মধ্যে পিতৃকুল অথবা মার্তৃকুলে উচ্চবর্ণের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আর এটি হচ্ছে দুইরকম বিবাহ অর্থাৎ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের মাধ্যমে। উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের মহিলাকে বিবাহ করলে বলা হয় 'অনুলোম বিবাহ' এবং উচ্চবর্ণের নারী নিম্নবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করলে বলা হয় 'প্রতিলোম বিবাহ'। এই ধরণের বৈবাহিক বন্ধন থেকে জন্মলাভকারী সন্তানদের জাতি কি হবে? পিতা ও মাতার জাতিকে ভিত্তি হিসেবে ধরে এ প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে [৯]।

বৌধায়ন ধর্মসূত্র, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মনুসংহিতা, মহাভারত, পরাশর সংহিতা, সূত সংহিতা, উশানস সংহিতা, বিষ্ণুধর্মসূত্র, যাজ্ঞবল্ক্য ও জাতিমালা ইত্যাদি স্রন্থ অবলম্বন করে ড. সুর মোট ৩১টি মিশ্র জাতির উল্লেখ্য করেছেন [১০]। নিম্নে এই মিশ্র জাতির তালিকা দেওয়া হল:

ক্রমিক সংখ্যা	জাতি	পিতা	মাতা
১.	অম্বষ্ঠ	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	
২.	আগুরি	করণ	রাজপুত
৩.	উগ্র	ক্ষত্রিয়	শুদ্র
		ব্রাহ্মণ	শুদ্র
		ব্রাহ্মণ	শুদ্র
		বৈশ্য	শুদ্র
৪.	কর্মকার	বিশ্বকর্মা	ঘৃতচি
		শুদ্র	ক্ষত্রিয়
		শুদ্র	ক্ষত্রিয়
৫.	করণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
৬.	চর্মকার	শূদ্র	বত্রিয়
		বৈদেহক	ব্রাহ্মণ
		বৈদেহক	নিষাদ
		অয়োগব	ব্রাহ্মণ
		তিবর	চণ্ডাল
		তক্ষণ	বৈশ্য
৭.	তিলি	গোপ	বৈশ্য
৮.	তিলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ
৯.	তামলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ
১০.	কংসবণিক	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
১১.	চণ্ডাল	শূদ্র	ব্রাহ্মণ
১২.	নাপিত	ব্রাহ্মণ	শূদ্র
		ক্ষত্রিয়	শূদ্র
		ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
		ক্ষত্রিয়	নিষাদ
১৩.	বাগ্দী	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
১৪.	হাড়ি	লেট	চণ্ডাল
১৫.	সুবর্ণবণিক	অম্বষ্ঠ	বৈশ্য
		বিশ্বকর্মা	ঘৃতচি
১৬.	গন্ধবণিক	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
		অম্বষ্ঠ	রাজপুত
১৭.	কায়স্থ	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
১৮.	কৈবর্ত	নিষাদ	অয়োগব
		শূদ্র	ক্ষত্রিয়
		ব্রাহ্মণ	শূদ্র
		নিষাদ	মগধ
১৯.	গোপ	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়
		ক্ষত্রিয়	শূদ্র
২০.	ডোম	লেট	চণ্ডাল
২১.	তন্তুবায়	শূদ্র	ক্ষত্রিয়
		বিশ্বকর্মা	ঘৃতচি
২২.	ধীবর	গোপ	শূদ্র
		বৈশ্য	ক্ষত্রিয়
২৩.	নিষাদ	ব্রাহ্মণ	শূদ্র
		ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
		ক্ষত্রিয়	শূদ্র
২৪.	পোদ	বৈশ্য	শূদ্র
২৫.	মালাকার	বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি
		ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ
২৬.	মাহিষ্য	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
২৭.	মোদক	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
২৮.	রজক	বৈদেহিক	ব্রাহ্মণ
		ধীবর	তিবর
		করণ	বৈশ্য
২৯.	বারুজীবী	ব্রাহ্মণ	শূদ্র
		গোপ	তন্তুবায়
৩০.	বৈদ্য	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
		শূদ্র	বৈশ্য
৩১.	শুঁড়ি	বৈশ্য	তিবর
		গোপ	শূদ্র

তেমনই অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, একই বর্ণের পিতা-মাতার সন্তানদেরকে গোষ্ঠিভুক্ত করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে। অতএব এই হিসাবে সমীকরণটি দাড়াঁয় এইরূপ:

অম্বষ্ঠ = কংসবণিক = নাপিত = গন্ধবণিক = কায়স্থ = নিষাদ = বৈদ্য
অম্বষ্ঠ = করণ = বাগদী = মাহিষ্য।

অর্থাৎ রক্তের মিশ্রণের ভিত্তিতে সকল জাতি সমান, কিন্তু তথাকথিত পণ্ডিত ও অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা সকল জাতি যে সমান, তা করতে দেয় নি। কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণে প্রদত্ত সংকরত্ব ভিত্তিক ৩৯টি জাতি তৈরির প্রায় তিন-চারশ বছর পরে (ষোড়শ শতাব্দী) ভিন্ন জাতি তালিকা পাওয়া যায় ময়ূর ভট্টের ধর্মপুরাণে। মনে হয় এটি একটি 'আন্তঃগোষ্ঠি' বিবাহ ভিত্তিক তালিকা। এই তালিকায় উল্লেখ্য ৩৮টি জাতি হচ্ছে: ১. সদগোপ, ২. কৈবর্ত, ৩. গোয়ালা, ৪. তাম্বুলি, ৫. উস্ত্রক্ষেত্রী, ৬. কুম্ভকার, ৭. তিলি, ৮. যোগী, ৯. আশ্বিন, ১০. তাঁতি, ১১. মালী, ১২. মালাকার, ১৩. নাপিত, ১৪. রজক, ১৫. দুলে, ১৬. শঙ্খধর, ১৭. হাড়ি, ১৮. মুচি, ১৯. ডোম, ২০. কলু, ২১. চণ্ডাল, ২২. মাজি, ২৩. বাগদী, ২৪. মেটে, ২৫. স্বর্ণকার, ২৬. সুবর্ণবণিক, ২৭. কর্মকার, ২৮. সূত্রধর, ২৯. গন্ধ বেণে, ৩০. ধীবর, ৩১. পোদ্দার, ৩২. ক্ষত্রিয়, ৩৩. বারুই, ৩৪. বৈদ্য, ৩৫. পোদ, ৩৬. পাকমারা, ৩৭. কায়স্থ ও ৩৮. কেওরা।

এছাড়াও বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ধর্মপুরাণের শ্রেণিবিভাজনের পরে আরও একটি শ্রেণিবিভাজন করা হয় যার নাম হল 'নবশাখ'। 'নবশাখ' হলেন তারাই যাদের হাত থেকে ব্রাহ্মণরা জল স্রহণ করত তারাই হলেন 'নবশাখ'। এই নবশাখরা হচ্ছে: ১. তিলি, ২. তাঁতী, ৩. মালাকার, ৪. সদগোপ, ৫. নাপিত, ৬. বারুই, ৭. কামার, ৮. কুম্ভকার ও ৯. মোদক [১১]।

তাই বলা যেতে পারে জাতিভিত্তিক তথাকথিত এই ব্রাহ্মণ্য সমাজ এবং অভিজাত সমাজ ব্যবস্থা হিন্দুদের যে কত ক্ষতি করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই এর কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন মনিষীগণ বারবার সাবধান করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বিবেকানন্দ কথামৃত স্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলা যায়; তিনি বলেছেন: 'যদি প্রয়োজন হয় সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি কর, বিধবাদের বিয়ে দাও। জাতিভেদ প্রথার মাথায় বাড়ি মারো, আবার এসব ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের বাড়াবাড়িতে তিনি ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন' [১২]।

ঋগ্বৈদিক যুগেও একই পরিবারের লোক কবি (স্ড়ত্রকার), ভিষগ্ (চিকিৎসক) এবং উপল প্রক্ষিণী (যাঁতার যব ভর্জনকারিণী) রূপে কাজ করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে:

কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী নানা।
নানাধিয়ো বসুষবোহনু গা ইব তস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব [১৩]।।

অর্থাৎ আমি স্ড়ত্রকার পুত্র চিকিৎসক কন্যা প্রস্ড়রের উপর যব ভর্জনকারিণী, আমরা সকলে ভিন্ন কর্ম করছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করে, সেরূপ আমরা ধন কামনাতেও তোমার পরিচর্যা করছি। অতএব হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। সামাজিক বিভাজন বর্ণভিত্তিক হলে এই সূক্ত রচিত হত না।

বর্তমানে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে সাধারণভাবে যে বিষয় উঠে আসে, তা আলোচনা করা যেতে পারে। দলিতদের সামগ্রিক অধিকার আন্দোলনের প্রায় একই ধরনের দাবি প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রের থেকে কিছু পাওয়া প্রধান হয়ে ওঠে, যার ফলে সম্পূর্ণ অধিকারের ধারণা, বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষার প্রসার, পুনর্বাসন, ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বা স্বীকৃতি লাভ তেমনভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবে এটাও ঠিক যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দলিত মানুষেরা অধিকার সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হয়েছে। অধিকার অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনের নজির দেখতে পাওয়া যায়। ফলে দীর্ঘকালীন ধারণার ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে অধিকার আন্দোলন হল প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত।

উল্লেখপঞ্জি

১. Origin and Growth of Caste in India, Vol-I, p.25.
২. মনুসংহিতা, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, ১।৩১।
৩. জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ, ১।৬৮-৬৯।
৪. শ্রৌতসূত্র, ২৬।১-৭।
৫. জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ, ২।২৬৬।
৬. প্রাচীন ভারতে শূদ্র, পৃ. ৬১।
৭. উপনিষদ, সম্পা. অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ, পৃ. ৬৯৭।
৮. বৌদ্ধ-হিন্দ-মুসলিম: সামাজিক বিবর্তন, পৃ. ২৩।
৯. তদেব, পৃ. ২৪-২৫।
১০. তদেব, পৃ. ২৬-২৮।
১১. তদেব, পৃ. ২৯।
১২. বিবেকানন্দ কথামৃত, পৃ. ২৫।
১৩. Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, p.16.

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

উপনিষদ। সম্পা. অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০০০ (প্রথম সংস্করণ)।
ঘোষ, পার্থ। শ্রেণি শ্রেণি সংস্রাম ও রাষ্ট্রবিপ-ব। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৩ (প্রথম সংস্করণ)।
চট্টোপাধ্যায়, হরপদ। বিবেকানন্দ কথামৃত । কলকাতা: বুলবুল প্রকাশন, ১৯১৪ (দ্বিতীয় প্রকাশ)।

দেবনাথ, আর এম। বৌদ্ধ-হিন্দ-মুসলিম: সামাজিক বিবর্তন । ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৫ (প্রথম প্রকাশ)।

ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী। প্রাচীন অপ্রাচীন । কলকাতা: কিশলয় প্রকাশন, ২০০৮ (প্রথম প্রকাশ)।

ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী। ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য । কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্ড়ক পর্ষদ, ২০১৫ (তৃতীয় সংস্করণ)।

ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী। ভারত ও ভারততত্ত্ব অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ । কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

শর্মা, রামশরণ । প্রাচীন ভারতে শূদ্র । কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৯ (প্রথম প্রকাশ)।

সিকদার, সুকুমার। মনুসংহিতার শূদ্রভাষ্য । কলকাতা: নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০৮ (প্রথম প্রকাশ)।

Ambedkar, B. R. Annihilation of Caste. New Delhi: Navayana Publishing Pvt Ltd, 1936 .

Dutt, Nripendra Kumar. Origin and Growth of Caste in India. Vol-I, Calcutta: The Book Company Pvt Ltd, 1931.

Jaiminīya-Nyāya-Mālā-Vistāra, Ed. Theodor Goldstucker, London: The Sanskrit Text Society, 1865.

Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India. Ed. Sylvain Levi, Jean Przyluski & Jules Bloch, The University of Calcutta, 1929.

Śrautasūtras, Ed. Kundan Lal Sharma, Punjab (Hoshiarpur): Vishveshvarand Book Agency, 2004.

Thapar, Romila. Interpreting Early India, England: Oxford University Press, 1992.

Published by

RAJSHAHI COLLEGE
Rajshahi 6000, Bangladesh
www.rc.gov.bd